Vol. 34 | No. 1 | 1990

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

লোকসাহিত্য সমীক্ষা

Volume	34
Issue	1
Year	1990
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মনোয়ারা হোসেন
Published online	February 1, 1991
DOI	10.62328/sp.v34i1.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v34i1.5
Pages	105-116
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

লোকসাহিত্য সমীক্ষা

মনোয়ারা হোসেন

ভূমিকা

লোকসাহিত্য, লোকসঙ্গীত বর্তমানে আনুষ্ঠানিকভাবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন ও গবেষণার বিষয়বস্তু। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে লোক সাহিত্যের পঠন-পাঠন এখনও সীমাবদ্ধ পর্যায়ে থাকলেও বাংলা লোকসাহিত্যের সমৃদ্ধি ও ঐতিহ্যের বিশ্বখ্যাতি রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দীনেশচন্দ্র সেন, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ক্ষিতিমোহন সেন, জসীমউদ্‌দীন, মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন বাংলা লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সম্প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। বাংলাদেশে পাশ্চাত্যধারায় লোকসাহিত্যের আনুষ্ঠানিক পঠন-পাঠন পরিচিতির কৃতিত্ব আশুতোষ ভট্টাচার্য, আশরাফ সিদ্দিকী ও মযহারুল ইসলামের। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা লোকসাহিত্যের পটভূমিকা অর্থাৎ লোকসংস্কৃতির পরিচয় দান প্রসঙ্গে লোকসংস্কৃতির সংজ্ঞা, স্বরূপ, সংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতির তুলনামূলক পর্যালোচনা, লোকসাহিত্যে ব্যক্তি সমষ্টি ও সমাজমানসের প্রতিফলন এবং লোকসাহিত্য সমীক্ষণের কিছু প্রয়াস সম্পর্কে আলোকপাত করেছি।

লোকসংস্কৃতির সংজ্ঞা ও পরিধি

'লোকসংস্কৃতি' শব্দটি ইংরেজী ফোকলোরের সমার্থক শব্দ। ১৮৪৬ সালে উইলিয়ম জন থম্‌স্ The Athenacum পত্রিকায় একটি পত্রে *'ফোকলোর'* শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। প্রথম দিকে এর পরিধি অতীত লোকসমাজের প্রচলিত রীতিনীতি

বা সংস্কৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ক্রমশঃ আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে লোকসাহিত্য, লোকচিত্রশিল্প, উৎসব অনুষ্ঠান প্রভৃতি এর অন্তর্ভুক্ত হয়।

লোকসংস্কৃতির সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে নৃবিজ্ঞানী টেইলর 'ঐতিহ্যে'র ভূমিকার প্রাধান্য দিয়েছেন। লোক সংস্কৃতি বলতে তিনি সেইসব উপকরণকে বুঝিয়েছেন যা ঐতিহ্যধারায় কখনো মুখে মুখে, ব্যবহারের মাধ্যমে, এবং চেষ্টা-প্রসূত অনুসরণ-অনুকরণের মাধ্যমে পূর্বপুরুষ থেকে উত্তরপুরুষের উত্তরাধিকারে আসে। জন হ্যারোল্ড ব্রনভ্যান্ড-এর সংজ্ঞাতেও ঐতিহ্যের ভূমিকাটি গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে ''এর মধ্যে গোষ্ঠী-চেতনা অনিবার্য। ফোকলোরের বিভিন্ন উপাদান বা বিষয়ের পাঠান্তর কথান্তরের মাধ্যমে রূপান্তর ঘটে। মূলতঃ এগুলি মৌখিক এবং এর একটা বড় ধর্ম চক্রমনশীলতা।''[১] আর. এম. ডবসনের (R. M. Dobson) ফোকলোর সম্পর্কিত সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ''ফোকলোর মূলতঃ ঐতিহ্য-আশ্রয়ী এবং এর মধ্যে বস্তুগত (লেপ, তোষক), বাক-আশ্রয়ী (কাহিনী), আচার-আচরণগত (রীতিনীতি) ইত্যাদি বিষয় রয়েছে। এছাড়া ফোকলোর মৌখিক এবং তা বংশপরম্পরায় প্রবাহিত।'' মূলতঃ''লোকসংস্কৃতি প্রাকৃত জনগোষ্ঠীর প্রাকৃত জনসমাজের সংস্কৃতি—গোষ্ঠীভুক্ত সকলের প্রত্যক্ষ মানবিক সম্পর্ক, আত্মিক সংযোগ ও গভীর আন্তরিকতা থেকে উৎসারিত।''[২]

বাংলার লোকসংস্কৃতির স্বরূপ

উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালীর হাতে যে আধুনিক সাহিত্যের সৃষ্টি তার সাথে প্রাচীন ঐতিহ্যের যোগ থাকলেও বাংলার প্রবহমান লোকসংস্কৃতির সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল না। মধ্যযুগেও দরবারী সাহিত্য-সংস্কৃতির সমান্তরাল ধারায় ফল্গুস্রোতের মতো প্রবাহিত লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি গৌড়, রাজমহল, ঢাকা বা মুর্শিদাবাদের রাজদরবারে ছিল অপাংক্তেয়।

স্বতন্ত্র ধারায় প্রবাহিত বাংলাদেশের এই লোকসংস্কৃতি কতকগুলি গতানুগতিক বৈশিষ্ট্যের সমষ্টি নয়। অনার্য, আর্য, আদিবাসী, উপজাতি, তুর্কী, পাঠান, মোগল, ইরানী, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ প্রভৃতি জাতি ও ধর্মের সামাজিক স্তরবিন্যাস এবং অঞ্চলভিত্তিক বৈশিষ্ট্য এই সংস্কৃতিকে জটিল ও বৈচিত্র্যময় করেছে। ভিন্ন ভিন্ন

সংস্কৃতির সংস্পর্শে নতুন সাংস্কৃতিক উপাদানের উদ্ভাবন, পুরাতন সংস্কৃতির অনাবশ্যক উপাদানের বিলোপ বা নতুন ও পুরাতন সংস্কৃতির সমন্বয়সাধনের মধ্য দিয়ে এই সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটলেও এর প্রবহমান অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যকেন্দ্রিক ঐতিহ্যের প্রত্যয়টি অক্ষুন্নই থেকে গিয়েছে; তাই জাতি-বর্ণ-সম্প্রদায়গত বা আঞ্চলিক সামাজিক দূরত্ব ও মানসিক ব্যবধানের মধ্যেও বিভিন্ন সংস্কৃতির সমন্বয়ে গড়ে ওঠা এ-সংস্কৃতি বাংলাদেশেরই লোকসংস্কৃতি।

বাংলাদেশে প্রচলিত লৌকিক উৎসব-অনুষ্ঠান, মেয়েলি ব্রতগুলির উদ্ভবের ইতিহাস পর্যালোচনায় লোকসংস্কৃতির স্বরূপ পরিচয় স্পষ্ট হবে। বাংলাদেশের গাজন উৎসবের উৎস আদিম কৃষিভিত্তিক সমাজ। এই উৎসব ছোট নাগপুরের আদিবাসী জাতির 'সহরুল' উৎসবেরই বাঙালী সংস্করণ মাত্র। মুসলমানদের বিবাহে হলুদের অনুষ্ঠান আদিম সমাজের 'সর্বপ্রাণবাদ' বা 'এনিমিজম' ধারণা থেকে উৎসারিত। ডরমনের আবিষ্কৃত কথক *'টবি'*[৩] এবং আশরাফ সিদ্দিকী বর্ণিত কিশোরগঞ্জের জনৈক ''কথকের অভিজ্ঞতা''[৪] আর বিশ্বাসের উৎস আদিম সমাজের সর্বপ্রাণবাদ। ওঁরাও জাতির মধ্যে প্রচলিত '' *কুকুটী* ব্রত'' উর্বরা শক্তির প্রতীক হিসাবে সন্তান কামনায় হিন্দু সমাজেও পালিত। দ্রাবিড় ও মুন্ডা উপজাতির আনন্দকেন্দ্রিক উৎসব *'করম'* অনুষ্ঠানের রূপান্তর ভাদু-পূজার অনুষ্ঠান। বাংলাদেশে আগত আর্য সংস্কৃতি এবং পূর্বে প্রচলিত অনার্য সংস্কৃতির সমন্বয়ে *'করম'* শাখা রূপান্তরিত হয়েছে ভাদু প্রতিমায়— আনন্দ উৎসবের সাথে যুক্ত হয়েছে আচার-সংস্কার। ওঁরাও উপজাতির- *'করম'* সঙ্গীতের সাথে ভাদুগানের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।[৫] বৈষ্ণবদের সাধন-ভজন গীত *'কীর্তন'* এসেছে ওঁরাও উপজাতির প্রেমসঙ্গীত *'কীর্তন'* থেকে। বৈষ্ণবদের ক্ষেত্রে যুক্ত হয়েছে রাধাকৃষ্ণের প্রেম। অনার্য লৌকিক প্রেম রূপান্তরিত হয়েছে আধ্যাত্মিক প্রেমে। অনার্য যুগের দ্রাবিড় বা অস্ট্রিক ভাষাভাষী-দের আরাধ্য দেবী 'চাণ্ডী' ছোটনাগপুরের ওঁরাওদের চাণ্ডী-দেবীকে অভিন্ন মনে করা হয়। ওঁরাওদের চাণ্ডীর মত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যর-এর প্রথম কাহিনীর কালকেতু ব্যাধের চণ্ডীদেবী বন্য পশুর ও শিকারের দেবতা। পরবর্তী কাহিনীর ধনপতি সদাগরের কাহিনীতে এই চণ্ডীই রূপান্তরিত হয়েছে গৃহপালিত পশুর দেবতায় ও গৃহদেবতায়। সভ্যতার বিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের যাযাবর শিকারী জীবন থেকে পশুপালক কৃষিজীবী সমাজে উত্তরণের এই ইতিহাস সভ্যতার বিবর্তন ও ক্রমবিকাশের ইঙ্গিতবহ। আর্য-অনার্য সংস্কৃতির সমন্বয়ের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ হিন্দুসংস্কৃতির 'চণ্ডীমণ্ডপ'। অনার্যদের *'ধুমকুড়িয়া,'*

'গীতভিড়,' 'ঘাটুল,' 'মোরুং', 'লোকপাস্তে' নামে পরিচিত সাধারণ গৃহগুলি ছিল সর্বসাধারণের সামাজিক সাংস্কৃতিক মিলনকেন্দ্র। পরবর্তীকালে অনার্য চাণ্ডীদেবতার পূজা ও উৎসব যখন চণ্ডীপূজা ও মঙ্গলচণ্ডীর পালাগানে রূপান্তরিত হল তখন অনার্য দেবীর মুক্তস্থানে প্রতিষ্ঠিত *'চাণ্ডীটাড়'* পরিণত হয় চণ্ডীমণ্ডপে। এই *'চণ্ডীমণ্ডপ'* ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য ছাড়া অনার্যদের সাধারণ গৃহের লৌকিক বিশেষত্বকেও ধারণ করেছে। *'চণ্ডী'র* জন্য তৈরী মণ্ডপের সাথে অনার্য ঐতিহ্য যুক্ত হয়ে বাংলার *চণ্ডীমণ্ডপ* ''বাংলার গ্রাম্যসমাজ, লোকোৎসব ও লোকসংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠলো।''[৬]

জনসংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতি

বাংলার লোকসংস্কৃতির স্বরূপ অনুধাবন করতে গেলে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে 'জনসংস্কৃতি' এবং লোকসংস্কৃতি অভিন্ন নয়। দোল-দুর্গোৎসব সর্বজনীন পূজাপার্বণ জনসংস্কৃতির উদাহরণ; কিন্তু *'পৌষপার্বণ'* উৎসব বা *'নবান্ন'* উৎসব, 'বৈশাখী মেলা' সম্পূর্ণ ভাবে লোকসংস্কৃতির উদাহরণ। প্রসঙ্গতঃ ক্রোবার (Kroeber)-এর লোকসংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত সংজ্ঞাটি উল্লেখযোগ্য। ক্রোবারের মতে লোকসংস্কৃতি লোক সমাজের সৃষ্টি,-এ লোকসমাজ তাদের দীর্ঘকালীন বসবাস, অভ্যাস ও জীবন- ধারণের মধ্য দিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে অন্তরঙ্গভাবে সম্পর্কিত। তাই শহরের কৃত্রিম সতত পরিবর্তনশীল পরিবেশের মধ্যে লোকসংস্কৃতি বিকাশ লাভ করতে পারেনা, বরং নাগরিক পরিবেশের প্রভাব এ-সংস্কৃতির বিনষ্টিকে অনিবার্য করে তুলবে।

বিভিন্ন দেশের লোকসংস্কারঃ সাদৃশ্যঃ বৈসাদৃশ্য

বিভিন্ন দেশের লোকসংস্কৃতির তুলনামূলক পর্যালোচনায় প্রত্যেক দেশের লোকায়ত বিশ্বাস সংস্কার এবং বিভিন্ন দেশের সংস্কারের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের স্বরূপ অনুধাবন করা যায়। জিসি হাটন (G.C Hutton) বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রসঙ্গে ডাক ও খনার বচনের উল্লেখ করেছেন।[৭] একাদশ শতকের সমাজ ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় ''শাকুন শাস্ত্রের''

অর্থাৎ সুলক্ষণ-দুর্লক্ষণ সংহিতার উল্লেখ করেছেন।[৮] এই শাকুন শাস্ত্রের বিভিন্ন বিধিনিষেধকেন্দ্রিক রচনাই ডাক ও খনার বচন। এ ধরনের সংস্কার ও বিশ্বাস বিভিন্ন দেশেরও বৈশিষ্ট্য। আমাদের দেশে বাদুড়, প্রজাপতি, কাক, টিকটিকি, ব্যাঙ, বিড়াল প্রভৃতি প্রাণী নিয়ে যে সংস্কার তা বিভিন্ন দেশেও লক্ষ্য করা যায়। আমাদের দেশে 'প্রজাপতি' বিবাহের সাথে সম্পর্কিত কিন্তু স্কটল্যান্ড বা আয়ার্ল্যান্ডে প্রজাপতি মৃত ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত। মৃত ব্যক্তির কাছে উড়ন্ত প্রজাপতি শুভ কল্যাণের ইঙ্গিতবহ। ইংল্যান্ডে প্রজাপতির সংস্কারে রঙের ভূমিকা রয়েছে। বছরের প্রথমে হলুদ রঙের প্রজাপতি প্রত্যক্ষদর্শীর অসুস্থতার ইঙ্গিত বহন করে অন্যদিকে সাদা রঙের প্রজাপতি শুভক্ষণের প্রতীক। তবে সেখানে প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে বছরের শুরুতেই প্রথমে দেখা প্রজাপতিটিকে হত্যা করতে হবে, না হলে সারাবছর খারাপ যাবার সম্ভাবনা। আমাদের দেশের মত বিদেশেও কাকের সংস্কারে সংখ্যার প্রসঙ্গটি গুরুত্বপূর্ণ। টিকটিকি নিয়েও আমাদের দেশে বেশ কিছু সংস্কার প্রচলিত। বাঁ দিকে টিকটিকি 'রাজা' হবার সম্ভাবনা নিয়ে আসে, কিন্তু ইংল্যান্ডে কনের যাত্রায় টিকটিকি শুভ নয়। আবার পাশ্চাত্যের কোন কোন জায়গায় প্রচলিত বিশ্বাস যে, কোন স্ত্রীলোকের হাতের উপর দিয়ে টিকটিকি চলে গেলে তার হাতের সেলাই ভাল হবে। টিকটিকি সম্পর্কিত একটি প্রাচীন বিশ্বাস এই যে গৃহের বাইরে ঘুমন্ত ব্যক্তিকে সাপ কামড়াতে আসলে টিকটিকি তাকে জাগিয়ে দিত। আমাদের দেশে কালো বিড়াল অলক্ষুণে কিন্তু পৃথিবীর কোন কোন দেশে কালো বিড়াল সৌভাগ্যের সূচক। পূর্ব ইয়র্কশায়রে কালো বিড়াল দেখা পাওয়া দুর্ভাগ্যের লক্ষণ কিন্তু কালো বিড়াল পোষার সাথে সৌভাগ্য জড়িত। তাই দেখা যায় সেখানে উপকূলে খনিতে নামবার সময় শ্রমিকরা 'বিড়াল' কথাটি উচ্চারণ না করলেও জেলেনী স্বামীর অর্থাৎ জেলের নির্বিঘ্নে দেশে ফিরে আসার প্রত্যাশায় বিড়াল পোষে। এসব বিশ্বাস এবং সংস্কারের চিহ্নকেই বহন করছে লোকসাহিত্য।

বিভিন্ন দেশের লোকসাহিত্যের তুলনা

লোকসাহিত্য লোকসংস্কৃতির ধারক ও বাহক। এই সাহিত্য পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন সংস্কার, বিশ্বাসের পার্থক্য নিরূপণ এবং সমাজমানসের স্বরূপ অনুধাবন করা যায়। বাংলাদেশে প্রচলিত প্রবাদ ''দুধ দেয়া গরুর লাথিটিও ভাল।'' এই প্রবাদটি ইংরেজীতে কিছুটা ভিন্ন—What use is a cow that gives

plenty of milk, if she kicks the pail over?" এই প্রবাদ দুটির মধ্য দিয়ে দু'দেশের মানস বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ ধরা পড়ে। রাশিয়ার এবং বাংলার লোকসাহিত্যের তুলানামূলক আলোচনায় সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। দু'দেশের লোককাহিনীতে হাল্কা কল্পনা বা অলৌকিক ঘটনা বা অতিমানবিক ব্যাপার রয়েছে। উপরন্তু দু'দেশেই সাপের পূজাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে লোকসাহিত্য। কিন্তু উভয় দেশের সর্পপূজার বিষয়-কেন্দ্রিক লোকসাহিত্য পর্যালোচনায় পার্থক্য দেখা যায়। রাশিয়ার লোকসাহিত্যের নায়িকা সাপের বিনাশ ঘটিয়ে সাপকে পরাজিত করেছে, কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ সাপের কাছে পরাজিত হয়ে সাপকে দেবীর আসনে বসিয়েছে। এই পার্থক্যের কারণ রাশিয়ার সমাজ ইতিহাসেই নিহিত রয়েছে। রাশিয়ার সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার পেছনে রয়েছে স্বৈরাচারী জারের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রাম আর পরিশ্রমের ইতিহাস। তুলনামূলকভাবে রাশিয়ার মানুষ বাঙালীর মত অতিরিক্ত আবেগপ্রবণ নয়।

বৌদ্ধ জাতকের *দশরথ জাতক* নামক কাহিনীতে ভাইবোনের বিবাহ ব্যাপারটি সহজভাবে উত্থাপিত হয়েছে। এর কারণ অনুসন্ধান করলে জানা যায় যে ভারতবর্ষে বহু প্রাচীনকালে এবং লিচ্ছবি বংশে ভাইবোনের বিবাহের রীতি প্রচলিত ছিল। এমন কি কিছু দিন আগেও মিশর, পারস্য, পেরু, শ্যাম, সিংহল, ওয়েলস প্রভৃতি দেশে এ ধরনের প্রথা প্রচলিত ছিল। এককালের অনুমোদিত প্রথা পরবর্তীকালে নিষিদ্ধ হলেও লোককথায় তা থেকে যায়। যেমন রাজপুত্রের পিতৃরাজ্যে ফিরে না-যাওয়া বা রাজকন্যাকে বিবাহ করে অর্ধেক রাজত্ব নিয়ে সুখে বসবাস করার মধ্যে মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পরিচয় বিধৃত। বাঙালীর দুর্ধর্ষ ঘোড়সওয়ার সেনা হিসাবে চিহ্নিত ডোমরা এককালে বাংলার সীমান্ত রক্ষা করলেও আজ তারা সমাজে অপাংক্তেয়। যে পারিপার্শিক অবস্থার উপর নির্ভর করে লোকসাহিত্যের উদ্ভব হয় তা অপরিচিত হবার ফলে লোকসাহিত্যের অনেক তাৎপর্যই অপরিস্ফুট থেকে যায়।

বিভিন্ন দেশের লোকসাহিত্যের যোগসূত্র

লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদানের পর্যালোচনা করলে বিশ্বব্যাপী যোগসূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন টাঙ্গাইলে প্রচলিত *'সোনার ময়ুর'* গল্পটি ইউরোপ

আমেরিকাতেও প্রচলিত। কলাবতি কন্যার রূপান্তর *সিন্ডেরেলা* গল্পে। ডরসন সংগৃহীত নিগ্রো লোককাহিনীগুলির মধ্যে *হাতী এবং শিয়াল* [১০] গল্পটির সঙ্গে আমাদের দেশের *কুমির ও শিয়াল* গল্পটির সাদৃশ্য আছে। রামায়ণ-এর কাহিনী বিভিন্ন অঞ্চলে কিছুটা পার্থক্য সহ পাওয়া যায়- 'বৌদ্ধ জাতকে'র *'দশরথ জাতক'* নামক রূপকথার গল্পটি এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। মূলতঃ বিভিন্ন কথা, ছড়া প্রভৃতি কাঠামোগত দিক দিয়ে অপরিবর্তিত থাকলেও বিভিন্ন দেশ কাল ভেদে তার রূপের পরিবর্তন ঘটে। *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য়* ১৩০৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় 'ছড়া পর্যায়ে প্রকাশিত কুঞ্জলাল রায়ের '১০' ও '১৪' সংখ্যক ছড়ার সাদৃশ্য বর্তমান। এই একই ছড়ার আরো একাধিক পাঠান্তরের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় বিভিন্ন জনের সংগ্রহে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সংগৃহীত 'ছড়া' বা ডক্টর বিজনবিহারী সংকলিত 'ছড়াছড়ি' পুস্তিকায় এ ছড়াটির ভিন্ন রূপ লক্ষ্য করা যায়। দেখা যায় জাতকের অনেক পশু-কথা এভাবেই কিছু পরিবর্তনসহ *পঞ্চতন্ত্র* বা হিতোপদেশ-এও রয়েছে। মূলতঃ এইসব ছড়া বা কথার উৎস লোকসমাজের মৌখিক ঐতিহ্য।

লোকসাহিত্যে সমাজমানস

স্বশিক্ষিত অভিজ্ঞ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সৃষ্ট লোকসাহিত্যে তাদের আশা-আকাঙক্ষা আনন্দ-বেদনার প্রতিফলন ঘটে। ব্যক্তিজীবনের বেদনা সেখানে সমষ্টির প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। তাই শ্রমজীবী মানুষের আশা আকাঙক্ষা মূর্ত হয়ে ওঠে রূপকথার অলীক কল্পনায়। বাংলা উপকথায় বাঘ চরম নির্বোধ, ভীরু ও কাপুরুষের ভূমিকায় উপস্থাপিত। এর সঙ্গে মালয়-ব্রহ্ম দেশের প্রভাব স্বীকার করে বলা যায় যে বাঘের কাছে পরাজিত, পর্যুদস্ত মানুষের প্রতিশোধস্পৃহাও সক্রিয়। পাশ্চাত্য সমালোচক Sten Konow শিয়ালকে পণ্ডিত হিসাবে চিহ্নিত করার কারণ হিসাবে ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির প্রভাবের কথা বলেছেন এবং তার বিশ্বাসঘাতকতার জন্য *'প্রত্ন অস্ট্রলয়েড'* জাতির উল্লেখ করেছেন। ঈশপের নামে প্রচলিত পশুকথাগুলির মধ্যে ব্যক্তিক জীবনের বেদনা সমষ্টির বেদনার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঈশপ ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্তি পেলেও গ্রীসের অভিজাত সমাজের বিদ্বেষ থেকে মুক্তি পায় নি। *'রাজহাঁস ও বক'*[১১] গল্পটিতে তার বঞ্চিত জীবনের বেদনা প্রকাশিত। মৃত্যু আসন্ন জেনেও রাজহাঁস আনন্দিত, কারণ মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তার জীবনের ক্লান্তিকর বঞ্চনার পরিসমাপ্তি ঘটবে, তাই মৃত্যুর দিন মুক্তির দিন। ঈশপের

নিঃসঙ্গ জীবনের দীর্ঘশ্বাস রয়েছে দার্শনিকের গল্পটিতে।[১২] বিখ্যাত পণ্ডিত দার্শনিক যখন তার নিজের বসবাসের জন্য ছোট একটি ঘর নির্মাণ করেছিলেন তখন সবাই তাকে প্রশ্ন করেছিল যে এত ছোটঘরে তিনি কিভাবে থাকবেন। পরিচিতদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন—

হায়! এই ছোট্ট ঘরটাই
যদি সত্যিকারের বন্ধু
দিয়ে ভরে দিতে পারতাম।[১৩]

এ দুটি গল্প ঈশপের ব্যক্তিমনের প্রকাশ নয়, সমষ্টির সমাজবেদনার প্রতিফলন।

লোকসাহিত্য উদ্ভবের ইতিহাস

লোকসাহিত্যের উদ্ভব কোথায় কখন কিভাবে হয়েছিল সে সম্পর্কে সঠিক ধারণা দেওয়া যায়না। লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদানের অসংলগ্নতা, পোষাক-পরিচ্ছদ, ঐতিহাসিক ব্যক্তির নাম প্রভৃতির মাধ্যমে আনুমানিক একটা কাল নির্ধারণ করা যায় মাত্র। *'ময়নামতী গান'*– এর সময় নির্ধারণ করতে গিয়ে দীনেশচন্দ্র সেন একাদশ শতাব্দীর উল্লেখ করেছেন। তিনি মনে করেন এ সময় *গোপীচন্দ্র* বর্তমান ছিলেন। তাঁর মত অনেক সমালোচকই গ্রহণ করেননি। জনশ্রুতির উপর ভিত্তি করে লোকসাহিত্য রচিত, কিন্তু ময়নামতীসম্পর্কিত জনশ্রুতির উদ্ভবের কাল সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায়না। আবার লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদানে বিধৃত পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার-সংস্কার দেশকালের প্রেক্ষিতে পরিবর্তিত হতে পারে। মৌখিক সাহিত্য বলেই এ-সাহিত্য প্রাকৃত প্রস্রবণের মত চির প্রবহমান ও সজীব, কিন্তু নির্দিষ্ট কালচিহ্নে চিহ্নিত নয়।

লোকসাহিত্যের অনেক উপাদানের উৎস যে আদিম সমাজ—এ ধারণা অনেকেই পোষণ করেন। ব্লুমফিল্ড (Bloomfield) মনে করেন[১৪] আদিম সমাজের মানুষের অনুসন্ধিৎসা এবং সারল্য দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে ছড়া, ধাঁধা ইত্যাদি। পৃথিবীর কোন কোন আদিম সমাজে বাৎসরিক কোন অনুষ্ঠানে, ফসল তোলার সময়, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে, বিবাহ উৎসবে বুদ্ধির পরীক্ষায় ধাঁধা বা ছড়া বলার রীতি ছিল।

প্রাচীন কালে মহাভারত-বকরূপী ধর্ম পঞ্চপাণ্ডবকে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করেছে। প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যে ছদ্মবেশিনী রাক্ষুসী স্ফিংস (Sphinx) যুবরাজ ইডিপাসকে 'মানুষ' সম্পর্কিত ধাঁধা জিজ্ঞাসা করেছে, খ্রীষ্টপূর্ব নবম শতাব্দীতে গ্রীক মহাকবি হোমার ধাঁধার উত্তর দিতে না পারায় মৃত্যুবরণ করেছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে গ্রীম মত প্রকাশ করেন যে বিভিন্ন দেশে প্রচলিত গল্প কাহিনীর উৎস ইন্দো-ইউরোপীয় মূলভাষা। এই ভাষার প্রাচীন রূপ বেদে রক্ষিত। সুতরাং গল্প কাহিনী ভারত থেকে জার্মানীতে এবং জার্মানী থেকে বিভিন্ন দিকে প্রসার লাভ করেছে। ম্যাক্স মুলার মনে করেন পুরাণ ভেঙে ভেঙে সর্ব লোককথার সৃষ্টি হয়েছে। থিওডোর বেনফার মতে ঈশপের গল্প ছাড়া আদিমতম রূপকথা, লোককথা গুলি ভারতবর্ষে উদ্ভুত হয়ে ইউরোপে গিয়েছে।

এরপর একই সঙ্গে একইভাবে পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলেও একই গল্প কাহিনীর উদ্ভব ও প্রচলন দেখে এনডিউ ল্যাং এগুলিকে প্রাচীন সমাজের ক্রমাগ্রসর ধারা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে আদিম সমাজ এসব গল্প কাহিনীর উৎস এবং এই কারণে একই ধরনের কাহিনীর বিচ্ছিন্ন দূরবর্তী অঞ্চলেও একই সাথে উৎপত্তি হতে পারে। পরে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জনের হাতে বিভিন্ন ভাবে যা বিকাশ লাভ করেছে।

লোকসাহিত্যচর্চার ইতিহাস

লোকসাহিত্য তথা সাহিত্যের লোকায়ত ধারার বিজ্ঞান সম্মত পর্যবেক্ষণ ও অনুশীলনের ক্ষেত্রে সুইডেনের বিখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ লিনিয়াস (Linnaeus, ১৭০৭-৭৮)-এর নাম উল্লেখ্য। সুইডেনে প্রতিষ্ঠিত হয় বিখ্যাত লোকসংস্কৃতির মিউজিয়ম যার প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন হেজেলিয়াস (Hazelius, ১৮৩৩-১৯০০)। লোকসংস্কৃতি অনুশীলনের এই আগ্রহ ক্রমশঃ আমেরিকা, গ্রীস, জাপান, স্পেন প্রভৃতি দেশে বিস্তার লাভ করে এবং সেসব জায়গায় বিভিন্ন ফোকলোর সোসাইটি এবং লোকসংস্কৃতি কেন্দ্রিক পত্র পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

ভারতবর্ষে লোকসাহিত্যচর্চার সূত্রপাত হয় ইংরেজদের হাতে। ইংরেজ কর্মচারীদের দেশী ভাষা আর ব্যাকরণ শেখাবার জন্য উইলিয়ম মর্টন, জেমস লঙ্

কিছু প্রবাদ সংগ্রহ করেন। রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম সাহিত্য হিসাবে লোকসাহিত্যের গুরুত্বকে অনুধাবন করেছেন। তিনি ছড়ার কাব্যরস, ছন্দ ও বিষয়বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে লোকসাহিত্য সংগ্রহকে উৎসাহিত করেছেন।

লোকসাহিত্য ও আধুনিক সাহিত্য স্বতন্ত্র ধারায় প্রবাহিত হলেও বিষয়বস্তু আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে উভয় সাহিত্যের মধ্যে একটা যোগসূত্র গড়ে ওঠে। লৌকিক কাহিনীকে কেন্দ্র করেই রচিত হয়েছে ভারবর্ষের লিখিত মহাকাব্য *রামায়ণ* ও *মহাভারত*। প্রসঙ্গতঃ রবীন্দ্রনাথ রচিত রঙ্গ কবিতাটি উল্লেখ্য। রবীন্দ্রনাথ সংগৃহীত বিখ্যাত একটি ছড়ার কিছু অংশ উদাহারণ হিসাবে দেওয়া হল—

জাদু, এতো বড় রঙ্গ জাদু এতো বড় রঙ্গ
চার ধলো দেখাতে পারো যাবো তোমার সঙ্গ।।
বক ধলো বস্ত্র ধলো, ধলো রাজহংস।
তা হ'তে অধিক ধলো কন্যে তোমার হাতের শঙ্খ।[১৫]

এর পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের রঙ্গ কবিতাটির উল্লেখ করা হলো—

এতো বড় রঙ্গ জাদু, এতো বড় রঙ্গ—
চার সাদা দেখাতে পারো যাব তোমার সঙ্গ
ক্ষীর সাদা, ননী সাদা, সাদা মালাই রাবড়ি
তাহার অধিক সাদা তোমার স্পষ্ট ভাষার দাবড়ি।

উপসংহারে বলা যায় যে, লোকসাহিত্য সংহত সমাজচৈতন্য থেকে উদ্ভূত প্রাকৃত জনগোষ্ঠীর মৌখিক সৃষ্ট সাহিত্য। লোকায়ত সংস্কৃতির ধারা, তার সমন্বিত রূপের স্বরূপ বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে লোকসাহিত্যে। লোকসাহিত্য লোকসংস্কৃতির ধারক ও বাহক। তাই বিভিন্ন দেশের লোকসাহিত্যের তুলনামূলক পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন দেশের সংস্কার-বিশ্বাস তথা সমাজ মনস্কতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন সম্ভব। বিভিন্ন দেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যের চিহ্নও বিধৃত হয় এ-সাহিত্যে।

আধুনিক সাহিত্য ও লোকসাহিত্যের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য থাকলেও যোগসূত্র থাকে। সাহিত্যের সমৃদ্ধি একটি জাতির সমৃদ্ধির স্বাক্ষর। আধুনিক সাহিত্যের সমান্তরাল লোকায়ত ধারার সাহিত্য স্থান পেলে একটি জাতির সাহিত্যের সামগ্রিক পরিচয় ফুটে ওঠে। তবে স্মর্তব্য যে, উন্নত সংস্কৃতির সংস্পর্শে মৌখিক সাহিত্য বিকাশ লাভ

করতে পারে কিন্তু কৃত্রিম সতত পরিবর্তনশীল পরিবেশের প্রভাবে লোকসাহিত্যের বিনষ্টি অনিবার্য হয়ে ওঠে।

তথ্যপঞ্জী

১. চিত্ত মণ্ডল, *ফোকলোরের স্বরূপ*, মির্জা নগর সরকারী আবাসন, ২৪-পরগনা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৩, পৃ. ৫৬

২. বিনয় ঘোষ, বাংলার *লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব*, অরুণা প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৮০, পৃ, ১

৩. আশরাফ সিদ্দিকী, *লোকসাহিত্য* (১ম খণ্ড), মুক্তধারা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৩, পৃ. ৬৮

৪. প্রাগুক্ত

৫. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোকসাহিত্য* (১ম খণ্ড), ক্যালকাটা বুক হাউস, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৫৪, পৃ. ৩৮

৬. বিনয় ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮

৭. শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, *বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা*,

৮. প্রাগুক্ত

৯. আশরাফ সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩

১০. প্রাগুক্ত

১১. সুধীর করণ, *লোকসাহিত্যে ঈশপ*, অশোক পুস্তকালয়, ৬৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ ১৯৭০, পৃ. ১১৬

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪

১৩. প্রাগুক্ত

১৪. আশরাফ সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪–২৯৭

১৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সঞ্চয়িতা*, বিশ্ব ভারতী, ১৯৭৫, পৃ. ৭৬.

১৬. আশরাফ সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত পৃ. ২১২